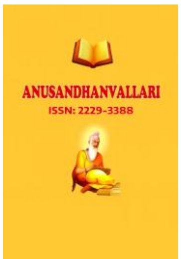

Anusandhanvallari
Vol 2022, No.1
March 2022
ISSN 2229-3388

The Literary Essence in the Short Stories of Sunil Gangapadhyay: A Brief Outline

Dr. Rahul Das
Department of Bengali,
Assam University

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতার রম্য প্রাসাদ এবং উপন্যাস সৌধের স্থপতি হয়েও ছোটগল্পের সূক্ষন কারুকৃতিরও রূপ দক্ষ শিল্পী বলা যেতে পারে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রসূত ঘটনা প্রবাহের সমবায়ে তাঁর ছোটগল্পের সম্ভার বহুমুখী অভিজ্ঞতায় বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে।তাই তাঁর গল্পবিশ্ব ও গল্প বীক্ষায় দেখা যায় অপরিমিত প্রাচুর্যের সমাবেশ। জীবনকে তিনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আবিষ্কার করেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং গভীরভাবে অনুভব করেছেন।বাস্তবের অজস্র ক্ষুদ্রতা, নীচতা, মহানতা ও মালিন্যের অভিব্যক্তিতে, সম্পর্কের বিভিন্ন ইন্দ্রজালের প্রচ্ছন্ন মাধুর্যে তাঁর ছোটগল্পগুলি হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যদিও মূলত কবি হিসেবেই বিশেষ জনপ্রিয়, কিন্তু লেখক সুনীল তাঁর গল্পে কবিয়ানাকে অনায়াসে দূরে সরিয়ে রেখে গদ্যকারের সাবলীল প্রকাশভঙ্গীতে গদ্যের জগতে বিচরণ করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের অনেক ছোটগল্পে এক ধরনের রোমান্টিক বিষণ্নতা রয়েছে, তবে প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে ছিল আত্মপ্রকাশ ও স্বীকারোক্তির ভঙ্গী, নিজেকেই আগা-গোড়া বিশ্লেষণ করার প্রবণতা যাকে বিংশ শতাব্দীর ছোটগল্পের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

পরপর পাঁচটি দশক ছুঁয়ে লেখক অবলীলায় কত গল্প লিখেছেন। তাঁর রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। উপন্যাস ও কবিতা লেখার ফাঁকে ফাঁকে ছোটগল্পের এই ঝর্ণাধারা অপূর্ব ব্যঞ্জনাগর্ভ ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। তবে শুধু বৈচিত্র্যেই নয়, জীবনের এক মূল্যবান দলিল হিসেবেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর ছোটগল্পগুলি। অত্যন্ত ব্যক্তিগত

জীবন এবং বৃহত্তর মানব জীবন এই দুই-ই তাঁর গল্পে ছায়াপাত করে গেছে।

গল্প সমগ্র ১ম খন্ডে তাঁর লেখা প্রথম দিকের গল্পগুলো সংকলিত হয়েছিল। বেশিরভাগ গল্পই হাল্কা, ঝকঝকে ও অনায়াস ভাষ্যে নির্ভার, মনোরম। যেমন-রাতপাখি, নদীর দু' তীর, হঠাৎ একটি নারী, চিরদিনের ঋণ, গল্পের নায়িকা, ঘুম জাগরণ, জানি না, মধ্যরাত্রির অতৃপ্তি, প্রতিবিম্বের জীবন, হলুদবাড়ি, নদী তীরে ইত্যাদি। এসব গল্পলেখার নেপথ্য ইতিহাস আজ কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু তারা যে সাহিত্য সংসারে এক নবীন আগন্তুকের পরম ভালবাসার সৃষ্টি তা গল্পগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যায়।

লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের গদ্য ভাষাটিও ভীষণ সাবলীল, ঝকঝকে, অনায়াস বহমানতাতেই এর শক্তির পরিচয়। আবেগ ও বাস্তবতার এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁর গল্পে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখা গল্পের গদ্যভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক নিজেই বলেছেন-

"ছাত্র বয়সে আমি যেমন কবিতা লিখেছি, তেমনি প্রেমপত্রও লিখেছি অন্তত দু'তিন হাজার। প্রেমপত্র সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে ওতে শুধু কবিতা আর উচ্ছ্বাস থাকলে কোনো কাজ হয় না-বেশ কিছু বাস্তব কথাবার্তাও থাকা দরকার। ঐভাবে আমি গদ্য লিখতে শিখেছি-আমাকে প্রাথমিক গদ্য শিক্ষা দিয়েছে আমার-প্রেমিকারা।"[১]

তাই তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ গল্পগুলিই এত সতেজ, সজীব ও প্রাণবন্ত। সুনীলের ছোটগল্পে উঠে এসেছে সমাজের নানাস্তরের নর-নারী, তাদের জটিল মনস্তত্ত্ব ও জীবনের নানা জটিলতা।সমাজের দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত এই তিনস্তরেই তাঁর অবাধ বিচরণ।তাই তাঁর লেখায় জটিল মানব মনস্তত্ব ও জীবনের বহুমুখীন জটিলতাগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে। কখনো কখনো রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে তাঁর গল্পগুলি ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে

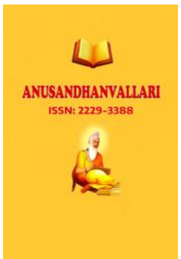

উঠেছে।মনো বিশ্লেষণ ও বাস্তবতার দিক থেকেও গল্পগুলি চমৎকার শিল্পগুণমন্ডিত। কিছু কিছু গল্পে বর্তমান সমাজের নীতিহীনতা ও শোচনীয় মানবিক অধঃপতনের শিল্প সংহত প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনা পাঠকের মর্ম বিদ্ধ করে।

এখানে ‘শাস্তি’ গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।এই গল্পটিতে লেখক এক শিশু পাচারকারী দলের কার্যকলাপ, নীতিহীনতা ও মানবিক অধঃপতনের এক নগ্ন রূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন, পুলিশ ইন্সপেক্টর শিশির পাচারকারী দলের পরিচারিকা শেফালি ও আরও কতিপয় চরিত্রের মাধ্যমে। এই গল্পটি থেকে আমাদের সমাজের নীতিহীনতা, অরাজকতা ও প্রশাসনিক উদাসীনতার এক বাস্তব ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই সময়ে কলকাতার মফঃস্বল এলাকায় কিছু কিছু পোড়ো বাড়ি ছিল যেগুলি নানা ধরনের অসামাজিক কাজের আস্তানা হয়ে উছেছিল, যেখানে নারী পাচার, শিশু পাচার থেকে শুরু করে আরও অনেক ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ সংগঠিত হত।

‘সোনামণির অশ্রু’ গল্পটিতেও লেখক একটি ছোট্ট মেয়ে সোনামণির অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বার্থান্বেষী সমাজের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অবক্ষয়িত রূপকে অনায়াসভাষ্যে জীবন্ত করে তুলেছেন রচনা কৌশলের মুন্সীয়ানায়। তাঁর গল্পগুলি গভীর সমাজ দৃষ্টি সম্পন্ন ও গাঢ় ব্যঞ্জনাময়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপুল গল্প সম্ভারের মধ্যে প্লটের বৈচিত্র্য যেমন চোখে পড়ে তেমনি আঙ্গিকগত নৈপুণ্য ও নতুনত্বও লক্ষ্য করা যায়। দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি, বৃত্তের বাইরে, হরিদাসপুরেগাছের ছায়ায়, মহাপৃথিবী প্রভৃতি গল্পগুলি এর উদাহরণ। প্রত্যেকটি গল্পের বুনোট, উৎসস্থল, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, পাত্র-পাত্রী সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্ন মাপের। আসলে শৈল্পিক চাহিদার তাগিদেই তিনি এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন, আর এখানেই তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

আঙ্গিকগত নির্মিতির দিক দিয়ে তাঁর 'দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি' গল্পটি ছোটগল্পের নির্মাণশিল্পের এক সেরা উদাহরণ।এই গল্পটির উপশিরোনামগুলি লক্ষণীয়। যেমন-লাল মিঞা, সব জায়গায় হাসিনা, লাইনে সন্ধ্যা, গণি চৌধুরীর মনোবেদনা, হাসিনার পূর্ব ইতিহাস, উপকারী সামসুল, আম বাগানে, পুকুরে চাঁদের ছায়া, সুখেন্দুবাবু, শুধু যাওয়া শুধু আসা, দেবদূত, এই উপ-শিরোনামগুলি বিশেষ বার্তাবহ এবং অর্থ সমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি উপ শিরোনামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গল্পবীজ। লেখক সেই গল্প বীজগুলোকে এক সূত্রে গ্রন্থিত করে মূল প্লটকে শক্তিশালী করে তুলেছেন।

এই গল্পটিতে লেখক মূলত বিপন্ন সময় ও সমাজকে অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন, সেই সঙ্গে এক লাঞ্ছিতা, অবমানিতা নারীর সমস্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননাকে ছাপিয়ে তার শাশ্বত মাতৃত্ববোধ গল্পটিকে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।গল্পটি মূলত হাসিনার জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। হাসিনার সুখ-দুঃখ এবং তিন সন্তানকে নিয়ে প্রতিনিয়ত টিঁকে থাকার লড়াই সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আবর্তের মধ্য দিয়ে গল্পে বর্ণিত হয়েছে এবং তুলে ধরেছে সমাজের কিছু বাস্তবচিত্রকে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের বাগিচায় ফুটে উঠেছে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র কুসুম।এই কুসুমগুলি কখনো বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সঞ্জাত, আবার কখনো বা অভিজ্ঞতা প্রসূত। ভ্রমণ পিপাসু লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন।তাঁর এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই তাঁকে বহুবিচিত্র গল্পের রসদ জুগিয়েছে।শুধু কল্পনার ডানায় ভর করে বাস্তব সম্মত সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি করা যায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তাই সমাজের বিভিন্ন চরিত্র এবং পরিপ্রেক্ষিতকে তিনি খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং অনুভব করতে পেরেছেন যা পরবর্তীকালে তাঁকে একজন সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সহায়তা করেছে।

ছোটবেলা থেকেই লেখকের জীবন বিভিন্ন আবর্তের মধ্যদিয়ে এগিয়ে গেছে।আর্থিক অস্বচ্ছলতা, গ্রামীণ জীবন, নগর জীবন, বাবার কঠোর পরিশ্রম, দেশ ভাগ, জাতিদাঙ্গা এসবই লেখকের জীবন প্রসূত অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতা প্রসূত বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন সময়ে স্থান পেয়েছে তাঁর বহুসংখ্যক ছোটগল্পে। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি অনায়াস ভাষ্যে বাস্তবসম্মত ও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর।

তিনি সংবেদনশীল উপভোক্তার মত মানবজীবন ও মানবমনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এর নির্যাসকে তুলে ধরেছেন গল্পের আকারে। তাঁর গল্পগুলিতে প্লট, চরিত্র, সংলাপ এবং মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি লেখকের জীবনদর্শনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই জীবনদর্শন এক উদার মানবতা থেকে তৈরি হয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ ‘শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী’ গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

‘শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী’ গল্পটি লেখকের এক অন্যতম প্রধান গল্প। গল্পটির প্রধান উপজীব্য মানবিকতা।এই গল্পটির মুখ্য চরিত্র হাজু মানবতার বীজ মন্ত্র দিয়ে গড়া। নির্বোধ, নিপাট ভাল মানুষ হাজুর ভাবলেশহীন উদাস চরিত্রটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কাহিনী।

একদিন গাজীপুরের হাটে ব্যাপারীদের মধ্যে মারপিট এবং লাঠিবাজিতে মাথা ফাটলো শুধু হাজুর। সে প্রতিবাদ করতে জানে না, ভীত জন্তুর মত চুপ করে শুধু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে। হাজুর ভাগ্যটাই এরকম। বিপদ যেন তাকে টানে, হাটে ক্ষ্যপা ষাঁড়টা শুধু হাজুকেই গুঁতিয়ে যায়, তাকেই জলঢোঁড়া সাপ দংশন করে। সবাই তাকে অবহেলা করে। সে একটা অকর্মণ্য, তাকে দিয়ে কিছুই হয় না। হাজুর এই অকর্মণ্যতাকে লেখক পরম সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।এখানেই লেখকের সৃষ্টি শীলতার সার্থকতা এবং তাঁর জীবন দর্শনের ও পরিচয় পাওয়া যায়।

“তার জীবনে সব কিছুই শ্লথ। খোদাতাল্লা তাকে এইভাবে গড়েছেন, সে কী করবে। দুপুরবেলায় আকাশের নীচ দিয়ে তার ছায়া দেখতে দেখতে

চলে। মোল্লা বাড়ির ছেলে হাজু যেন হিন্দু বাড়ির এঁড়ে। সে কখনো কোন কাজে লাগলো না।’’[২]

অথবা

‘‘সবাই জানে, হাজুর মতন নিপাট ভাল মানুষ কখনো মার খাওয়ার মতন কোনো কাজ করতে পারে না। তবু কী বিচিত্র এই দুনিয়া, হাজুই মার খায়।’’[৩]

চালাকচতুর মানুষদের দুনিয়া জোড়া হাটে বোকা কিন্তু ভালোমানুষ হাজু কিঞ্চিৎ বেমানান; বরং কলকাতার দামী হোটেলে ‘পৌচ্ছাবখানার অ্যাটেন্ডেন্ট’ হয়ে সে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এ কাজ তার কাছে লজ্জা বা অপমানের নয়, বরং পরম আনন্দের। একদিন এই মূত্রাগারের দেয়াল বেয়ে এগিয়ে আসছিল এক দঙ্গল লাল পিঁপড়ে। পিঁপড়ের সারির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাজুর মনে পড়ে যায় কলকাতায় আসার পথে সুলেমানপুরের কাছে দেখা মানুষের মিছিল। মিছিলটা খালের ধার দিয়ে এসে সাঁকো পার হচ্ছিল। হাজু কল থেকে খানিকটা জল হাতে নিয়ে চক্‌চকে দেয়ালে একটা রেখা টানলো। হাজুর কাছে এই রেখার অর্থ হল সেই খাল। আবার খানিকটা জল নিয়ে সে আবারও রেখা আঁকলো। এই রেখাটা হাজুর কাছে সেই সাঁকো। কি আশ্চর্য পিঁপড়ের সারি সেই জলরেখার সামনে এসে থেমে গেল। হাজু আরেকটু মোটা জলের দাগ দিতেই পিঁপড়ের মিছিলটি পাশ ফিরে অন্য পথ ধরলো। হাজু আশ্চর্য হয়ে যায়। এরা তার কথা শুনছে, তাকে মানে। জীবনে সে এত আনন্দ কোনদিন পায়নি। হাজু বা শাজাহানের নিজস্ব বাহিনী কোন মানুষ নয়, এই এক দঙ্গল পিঁপড়ে। হাজু তাদের সঙ্গে কথা বলে, নির্দেশ দেয়। প্রয়োজনে তাদের পথ পালটে দেয়। আসল কথাটা কিন্তু এই নির্বোধ হাজুই বুঝতে পেরেছিল, তাই তো সে ফিসফিস করে বলে উঠলো-

‘‘সেই ভালো বাপজানেরা, কী দরকার ওদিক পানে যাবার? শুধু শুধু দাঙ্গা কাজিয়া করে কী লাভ? এদিকেও তো কত জায়গা রয়েছে।’’[৪]

নির্বোধ হাজুর এই জীবন দশর্ন এবং মানবিকতা আমাদেরকে অভিভূত করে দেয়।

‘রাজহংসী’ নামে আরেকটি সুন্দর গল্প আছে যেটি পড়লে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন দর্শনকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সব মহৎ লেখকের মত তাঁর মধ্যেও একটা নৈতিক দৃষ্টিকোণ আছে। তবে তাঁর নৈতিক মূল্যবোধ কোন সঙ্কীর্ণ শুচিতাবোধের ভ্রান্তিতে এসে অবসিত হয় না, বরং তা উদার, উষ্ণ, ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পেই মানুষের প্রতি এক প্রগাঢ় ভালবাসা ও সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি একটা সরল বিশ্বাস ও ভালবাসা নিয়ে তিনি হাঁটতে শুরু করেছিলেন। জীবনের পথে সেই বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁর আজন্মবজায় ছিল। তাই তো ‘রাজহংসী’র নায়িকা খুকুর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, নিষ্ঠুরতা ও বহুগামিতা সত্ত্বেও কঠিন বিচারকের মনোভাব নিয়ে কোনো রায় দেননি, তাকে পাপিষ্ঠা সাব্যস্ত করে কোনো নিষ্ঠুর শাস্তিবিধানও করেননি। খুকু এক বিষ কন্যা, পুরুষদের সে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যু মরীচিকার মরুভূমিতুল্য হাহাকারে। তবু তিনি রাগ অথবা তাকে ঘৃণা করতে পারেননি, বিশ্বস্রষ্টার মতোই তিনি নিরপেক্ষ, নির্বিকার ও ক্ষমাশীল। এই তাঁর জীবনদর্শন, এই তাঁর মহত্ত্ব।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে আমরা কল্পনা ও বাস্তবকে একত্রে মিলিয়ে দেবার এক আশ্চর্য চেষ্টা দেখতে পাই। সেখানে বেশ কিছু সংলাপ গল্পকে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। তাঁর ছোটগল্পগুলি যেন এক আশ্চর্য বাগিচা। সেই বাগিচা আলোকিত করে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অসংখ্য ফুল, যাদের রূপ ও সৌরভ বিমোহিত করে তাঁরই প্রিয় পাঠকদের।

তাঁর কোনও গল্প উঠে এসেছে সমাজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে, কোনও গল্পে আবার আশ্চর্য মিথ, ইতিহাস, প্রান্তিক গ্রাম্য জীবনের আনন্দ বেদনার আলোছায়া বিস্তৃত অংশ জুড়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পে দেশ বিভাগ, জাতিদাঙ্গা ও সেই সময়কার কিছু বাস্তব ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন গল্পের আকারে, যা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন।

লেখক নিজেও দেশ বিভাগের শিকার হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও তাঁর নাড়ির টান ছিল পূর্ববঙ্গের সঙ্গে।সেখানেই তাঁর আদি নিবাস এবং জন্ম। দেশবিভাগের পূর্বে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং মাঝে মাঝেই ছুটে যেতেন পূর্ববঙ্গে মাইজগ্রামের পৈতৃক ভিটেতে কিংবা আমগ্রামের মামাবাড়িতে। দেশ বিভাগের ফলে স্বদেশ হারানোর বেদনা তাই লেখকের মনকেও ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

তাঁর ‘মাত্র আধখানা শতাব্দী’ গল্পটি উঠে এসেছে এই দেশ ভাগ ও তার পরবর্তী জাতিদাঙ্গার প্রেক্ষাপট থেকে। এই গল্পটিতে লেখক দেশ ভাগ ও তার পরবর্তী জাতিদাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় দেশের জনগণকে কীভাবে তাদের বসতভিটে ত্যাগ করে দেশত্যাগী হতে হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয়শ্রেণীর লোকেদের জন্মভূমির প্রতি গভীর প্রাণের টান বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন ঘটনার সমাহারে।

দেশভাগ প্রতিটি ভিটেমাটিহারা জনগণের কাছেই এক বিরাট কালো অধ্যায়, এক বীভৎস স্মৃতি যা নতুন দেশে এসে পুনর্বাসনের পরও তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। জন্মভূমির প্রতি গভীর প্রাণের টান কখনো কখনো মনকে ব্যাকুল করে তুলে, ফিরে যেতে মন চায় সেই সুদূর অতীতের ফেলে আসা নদী, মাঠ-ঘাট, প্রান্তরে। অট্টালিকার বিলাসিতাময় জীবন সত্ত্বেও অনেকে মাটির ঘর, মাটির উঠোন, বাঁশবনে ঘেরা কলমী পুকুর এই মেঠো জীবনের মমতামেদুর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে ফিরে যেতে চান সুদূর অতীতের ফেলে আসা সেই মাটিতে।

অতি তুচ্ছ ঘটনাও অনেক সময় স্মৃতির প্রেক্ষাপটে অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই তো ওপারে ফেলে আসা টিয়াঠুঁটি আমের বিশাল বৃক্ষ ও চটাস্ চটাস্ করে পুঁটি মাছ ধরার স্মৃতি ব্যাকুল করে তুলে এপার বাংলায় অবস্থানরত অকালবুড়িদের। এক অকালবুড়ির মুখ দিয়ে লেখক সেই সময়কার এক ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন-

“দ্যাশটারেই কাইট্যা ফ্যালাইসে। আর তুমি কও গাছের কথা।”[৫]

বেলেঘাটার এক বস্তির অতীত পটভূমিকে কেন্দ্র করে লেখক জাতিদাঙ্গার এক বীভৎস নির্মম বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এই গল্পটিতে। গল্পটি পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই সময়কার ভয়াবহ নির্মম বাস্তব ছবি।মানব ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়, যা সভ্য সমাজের কলঙ্ক। লেখক খুব স্পষ্ট ভাষায় সেই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যা বর্ণনার গুণে ইতিহাস থেকে সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

“এদিকে নাড়ায়ে তকদির, আল্লাহো আকবর ওদিকে বন্দেমাতরম! ভারতমাতা কি জয়! মাঝখানে রক্তের স্রোত। রাস্তায় পড়ে থাকা লাশের পচা গন্ধ।...ছলাৎ ছলাৎ করে কেরোসিন ছেটাবার শব্দ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব পুড়ে ছাই।”৬

দেশভাগের বলি হেদায়েত হোসেনের স্মৃতিতে ধরা পড়ে জাতিদাঙ্গার এক ভয়াবহ করুণ রূপ। দাঙ্গায় আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের এক মুসলমান পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে সপরিবারে পালিয়ে যায় পূর্ববঙ্গে। কিন্তু কোলের ছোট ছেলেটিকে দাঙ্গার আগুন থেকে বাঁচাতে পারেনি। হেদায়েত হোসেনের মত আরও কত পরিবার সেদিন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সে আজ সত্যিই শুধু ইতিহাস।

কথা সাহিত্যিক সুনীলের স্মৃতিতে জাগরিত ছিল সমাজ এবং জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তাঁর দরদী মন প্রতিনিয়ত অন্বেষণ করে ফিরেছে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের শোষণ পীড়ন ও অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা না বলা কথার বাণী।এই অন্বেষণ থেকে বঞ্চিত হয়নি জেলখানার কয়েদিরাও।‘এলাচের কৌটো’ গল্পটি-এর উদাহরণ।এই গল্পে লেখক কিছু মেয়ে কয়েদিদের কথা তুলে ধরেছেন, যারা পুরুষদের বঞ্চনার শিকার হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে জেলখানা তথা সংশোধনাগারে।এদের ব্যথা বেদনার করুণ কাহিনী লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়।অথচ লেখক সুনীল অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই মেয়ে কয়েদিদের অন্তর্দহন গল্পের মোড়কে পাঠকদের সামনে

উপস্থাপিত করেছেন, যা এই কয়েদিদের সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দিয়ে এক নতুন দৃষ্টি পথের উন্মেষ ঘটায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে আছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। তাঁর রচিত চরিত্রে জীবনের রূপ, রস, গন্ধ ও আশা-আকাঙ্খার অভিনব প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের গল্প জগতে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি স্বমহিমায় বিরাজিত। প্রত্যেকেরই নিজস্ব সত্তা আছে। জীবনকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। মানুষের প্রতি গভীর আস্থা ও ভালবাসা তাঁর সাহিত্যকে যে অভিনবত্ব দান করেছে তা সম্পূর্ণ স্বকীয়। তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয় চিন্তা ও উপলব্ধির গভীরতা, সেই সঙ্গে জীবনের প্রতি গভীর মমত্ব ও ভালবাসা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সলিল মিত্র বলেছেন-

“বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, পরিবেশন ক্ষমতায় তিনি এতোই দক্ষ যে পাঠকের তা এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় থাকে না। বিষয় শক্ত ও জটিল কিংবা অতি তুচ্ছ হলেও তাঁর কলমের কারুকার্যে সহজ সুন্দর সাবলীল হয়ে পাঠকের সামনে এসে পৌঁছয়।”[৭]

লেখক যখন তাঁর গল্প বিশ্বের মধ্য গগনে বিরাজমান তখন আমাদের সমাজ জীবনে বিরাজ করছিল এক অস্থির পরিবেশ। একদিকে নগরকেন্দ্রিক জীবনে নব্য আধুনিকতার প্রভাবে স্বাধীনতার নামে যুব সমাজের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, বিলাসিতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন প্রান্তিকায়িতের গন্ডীবদ্ধ জীবনে দু’মুঠো অন্নের জন্য কাতর আর্তনাদ ও সেইসঙ্গে অন্ধবিশ্বাস। ক্ষুধার জ্বালা ও অন্ধবিশ্বাস যে মানুষকে কখনও কখনও অন্ধ করে তুলে তার জ্বলন্ত উদাহরণ ‘গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প’। এই গল্পটি আমাদের সাধারণ ভৌতিক সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এটাকে ঠিক ভূতের গল্প বলা যায় না। ভৌতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের অপার রহস্য, দূরাস্তৃত জীবনের অশরীরী ব্যঞ্জনা প্রভৃতি এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, এতে

প্রাকৃত অপ্রাকৃতের ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষের রিক্ত জীবনের রূপরেখা তথা সামাজিক ও ব্যক্তিক নৈতিকতা, মূল্যবোধের অবনমন এবং ব্যক্তির সামাজিক ও আত্মিক বিপন্নতা নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পটি।

সাহিত্যিক সুনীলের লেখায় কত রকমভাবে সাধারণ মানুষেরা যে উন্মোচিত হয়েছে কথকতার নিপুণ বিন্যাসে তার ইয়ত্তা নেই। কখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কখনও নিরন্তর আর্থিক সংকটবিদ্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত, কখনও দরিদ্র এবং তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের বহুরকম মানুষকে নিয়ে তাঁর গল্পের ভুবন সমাকীর্ণ। তিনি সর্বদাই প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবন সত্যের বিচ্ছুরণ থেকে মানুষের অভিনব পরিচয় উন্মোচনে আগ্রহী।

‘সমান্তরাল’ গল্পটিতেও লেখক দারিদ্র্যের এক ভয়ংকর সর্বনাশা রূপ ও নৈতিক অবনমন চিত্রায়িত করেছেন ইউসুফ চরিত্রের মধ্য দিয়ে, যে দু’মুঠো ভাতের জন্য সহযাত্রীর ছদ্মবেশে পান্নালালের সঙ্গে প্রতারণা করে তার পাঁচ বছরের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লুঠ করে তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আবার ঘাতক ইউসুফ আলির মৎস্যপ্রীতি ও পশুপ্রেম এবং সেইসঙ্গে সপ্তাহখানেক পর বাবা মেয়েতে মিলে দু’মুঠো গরম ভাত মুখে দেওয়ার আনন্দকে রূপায়িত করে ইউসুফের প্রতি সহানুভূতির একটা পরিসর তৈরি করে দিয়েছেন।

মধ্যবিত্ত মানসিকতা, মধ্যবিত্তের ভঙ্গুর মূল্যবোধ যেমন তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তিনি পরম মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গে সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনবীক্ষা অবলোকন করেছেন।হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কেই তিনি তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন।চারদিকে বিস্তৃত মানব বিশ্বের সঙ্গে তাঁর নিবিড়তর যোগ ছিল। সৃষ্টির তাগিদেই তিনি জগৎ ও জীবনকে আত্মিকভাবে চিনতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন এবং বুঝতে চেয়েছেন।

দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গে হিন্দু এবং মুসলমানরা পাশাপাশি সহাবস্থান করত এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক বজায় ছিল। লেখক যদিও তাঁর বাবার কর্মসূত্রে কলকাতাতেই থাকতেন, তবু পূর্ববঙ্গে পৈতৃক বাড়ি ও মামা বাড়িতে তাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সেই সুবাদে সেখানে লেখকের কিছু মুসলমান বন্ধুও ছিল। মুসলমান সমাজকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। পরবর্তী জীবনেও বিভিন্ন সময়ে তিনি বহু মুসলমান পরিবারের সান্নিধ্যে আসেন এবং খুব কাছ থেকে তাদের জীবনবীক্ষা অবলোকন করেছেন। একবার ফিরোজ চৌধুরীর সঙ্গে টানা সাতদিন তিনি এক মুসলমান গ্রামে থেকে এসেছেন। তাই তাঁর অনেক গল্পে উঠে এসেছে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন পাত্র পাত্রী ও তাদের জীবনের কিছু বাস্তব ছবি। এইরকমই কয়েকটি গল্প হলো একটি গ্রাম্য পটচিত্র, দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি, তাজমহলে এক কাপ চা, মাত্র আধখানা শতাব্দী, জেটিঘাট ইত্যাদি।

মুসলমান সমাজে ‘তালাক’ নামক একটি জঘন্য প্রথার জন্য কত মেয়েকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয় এবং সেই প্রথা কীভাবে একজন স্ত্রীকে এক মুহূর্তে তারই নিজের হাতে গড়ে তুলা সংসার থেকে দূরে ঠেলে দেয় ‘একটি গ্রাম্য পটচিত্র’ গল্পটির দিলারাবিবি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক আমাদেরকে সেই ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, যা প্রতিটি হৃদয়বান পাঠককে ভাবিয়ে তুলে।

‘দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি’ গল্পটিতেও লেখক হাসিনা নামের এক স্বামীহারা মুসলমান নারীর সুখ দুঃখ এবং তিন সন্তানকে নিয়ে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার লড়াইকে গল্পের আধারে উপস্থাপিত করেছেন।

লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন চরিত্রের সাহচর্যে এসেছেন এবং অন্তর দিয়ে মানব মনস্তত্ত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর কিছু কিছু গল্পে জটিল মানব মনস্তত্ত্বকে তিনি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন।

‘রহস্য কাহিনী নয়’ গল্পে লেখক নীলাঞ্জনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানব মনস্তত্ত্বসত্যিই খুব জটিল। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে কিন্তু এই প্রশংসাও যে কখনো কখনো মানুষের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং অন্তর থেকে নিজেকে প্রতিবাদী করে তুলতে চেষ্টা করে লেখক নীলাঞ্জনা চরিত্রের মাধ্যমে এই জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নীলাঞ্জনা খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে।নিজের ইচ্ছেকে জোর দিয়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা তার নেই। তাই অন্যের চাপিয়ে দেওয়া ইচ্ছা সে মেনে নিতে বাধ্য হয়।আসলে সে প্রতিবাদ করতে পারে না।তার এই শান্ত স্বভাবের জন্য সবাই তাকে খুব ভালবাসে ও প্রশংসা করে। কিন্তু নীলাঞ্জনা জানে এটা তার অক্ষমতা।সে প্রতিবাদ করতে পারে না বলেই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্যের ইচ্ছাকে সে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই তাকে কেউ বাধ্য মেয়ে বলে প্রশংসা করলে সে মনে মনে রাগে ফুঁসতে থাকে। আর এই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে লুকিয়ে ঘরের কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেলার মাধ্যমে। এই রাগ থেকেই সে একদিন সবার অজান্তে স্নানাগারের মগ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল পাশের পুকুরটিতে। আরও একদিন ভেঙ্গে ফেলেছিল তারই প্রিয় টেবিল ঘড়িটা।

দাদার স্বাধীনভাবে বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়াটা নীলাঞ্জনার মনে ঈর্ষার জন্মদেয়। কারণ সে নিজেও এভাবে বেড়াতে যেতে চায়, কিন্তু নিজের মনের ইচ্ছাটা কারো কাছে প্রকাশ করতে সে অক্ষম। তাই রাগে সে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা পাহাড়ের মানচিত্রটাকে ফালা ফালা করে নিজের মনের জ্বালা মেটায়। অথচ কেউ ভাবতেই পারেনি নীলাঞ্জনার মত এত শান্ত, বাধ্য মেয়ের পক্ষে এই কাজগুলো করা সম্ভব।তাই এই ঘটনাগুলো সবার কাছে রহস্য হয়েই রইলো।মানব চরিত্র এবং মানব মনস্তত্ত্বসত্যিই খুব জটিল। নিজের অক্ষমতা জনিত অন্তর্দ্বন্দ্বে কত মানুষ যে প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত হয়, বাইরে থেকে তার সামান্যতম আভাসটুকমাত্রও পাওয়া যায় না।

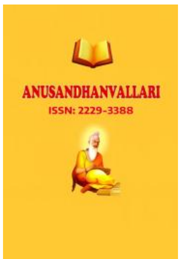

লেখক বিভিন্ন সময়ে বিদেশের বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই বিদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁর কিছু কিছু গল্পে পাশ্চাত্য চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের জীবন যাত্রা, মানসিকতা, আবেগ, অনুভূতি, ভালবাসার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্পে।লেখক নিজে বিদেশে বহু নারীর সাহচর্যে এসেছেন এবং অন্তর দিয়ে তাদেরকে উপলব্ধি করেছেন। অনেকের সঙ্গেই লেখকের সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর গল্পের বিদেশী নারী চরিত্রগুলি এত সজীব হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও প্রাক্তন স্বামী স্ত্রীরা বন্ধুত্বপূর্ণ সহজ, স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং এ নিয়ে তাদের সমাজে কেউ কোন কথাও বলে না।

'অপ্রেম পত্র' গল্পের জার্মান মেয়ে রোজাও তাই অনায়াসে তার বর্তমান জার্মান স্বামী ক্লাউসকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামী ফিরোজের সন্তানকে ভদ্রতা করে দেখতে আসে। সে এবং তার স্বামী দুজনের কাছেই এটা একটা স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক আচরণ। বিবাহ বিচ্ছেদ পাশ্চাত্য নারীদের জীবনে বিশেষ কোন রেখা পাত করে না। বিবাহ বন্ধন তাদের কাছে জন্মজন্মান্তরের অটুট বন্ধন নয়। চাইলেই যে কোন সময় অনায়াসে সেই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। তারা বন্ধনহীন মুক্ত মনের মুক্ত মানুষ। তবে দেশ কাল, জাতি ধর্ম ও সামাজিক রীতি নীতির উর্ধে মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি, ভালবাসা ও ব্যথা বেদনা। তাই রোজার হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠার মধ্যদিয়ে লেখক নারীত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত এক নারীর অন্তর্বেদনা ও সন্তানের জন্য এক অব্যক্ত হাহাকার গল্পের মাধুর্যে পাঠককুলকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন।

'আমার একটি পাপের কাহিনী' গল্পের ইটালিয়ান মেয়ে মোনিকার জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে লেখক পাশ্চাত্য সমাজের আরও একটি দিক উন্মোচিত করেছেন। পাশ্চাত্য রীতিতে লালিত নারীরা অতি সহজেই তাদের ভালবাসার মানুষের কাছে দেহ মন দুটোই সমর্পণ করে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। শারীরিক সম্পর্ক তাদের কাছে মনের সম্পর্কের মতোই।ভালবাসাকে তারা দেহ এবং মন দুটো দিয়েই উপভোগ করতে

চায়, এর জন্য বিয়ের প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় সংস্কৃতিতে লালিত লেখক (যদিও আধুনিক মনস্ক) ক্ষণকালের পদস্খলনের জন্য হয়ত বা লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। তাই তিনি মোনিকাকে বিয়ে করে গ্লানিমুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোনিকার কাছে এটি একটি সাধারণ ঘটনা। এটাকে সে পাপ বলে মনে করে না বা এতে দেহজ শুচিতা নষ্ট হয়ে যায় বলেও সে বিশ্বাস করে না। তাছাড়া শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে বলেই যে কাউকে বিয়ে করতে হবে এটাও সে মানতে রাজি নয়। শারীরিক শুচিতা নয়, মনের পবিত্রতাই বড় কথা। মনের দিক থেকে সে সৎ, সাহসী এবং জীবনমুখি। লেখকের ভাষায়-

"এমনিতে খুব রূপসী নয় মোনিকা-একটু বেশি লম্বাটে, উচ্চতায় প্রায় আমার কাছাকাছি কিন্তু ভারী ছটফটে। সহজ স্বাভাবিকতার মধ্যে যে সৌন্দর্য-মোনিকা সেই সুন্দরী। কোনোরকম আড়ষ্টতা নেই, কোনো পাপ নেই, অকপট সরল ওর ব্যবহার। ওর সাহচর্যে আমিও সৎ হয়ে উঠতে লাগলুম।"[৮]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলি তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ফসল। এই প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে আলোকপাত করেছেন সমাজে নারীর অবস্থান ও তার পরিসর নিয়ে।তাঁর গল্পে নারীদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বেশ কয়েকটি গল্পে তিনি নারীদের জীবন সংগ্রাম, অসহায়তা ও পুরুষ প্রতিনিধির দ্বারা নারীদের নিপীড়ন, নির্যাতন ও মানসিক লাঞ্ছনার ছবি নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন।

'প্রথম মানবী' গল্পে আমরা দেখতে পাই সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে পুরুষ কীভাবে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, নারীরা কীভাবে পুরুষের আধিপত্যের শিকার হয়ে এসেছে এবং প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে পুরুষ আধিপত্য কীভাবে স্তিমিত করে দিয়েছে।

'একটি গ্রাম্য পটচিত্র' গল্পটিতে আমরা দেখি পুরুষশাসিত সমাজে আজও নারীর অবস্থানটা ঠিক কোথায়। দিলারার করুণ পরিণতি

আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও নারী কত অসহায়। ধর্মের দোহাই দিয়ে আজও কত নারীকে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বলি হতে হয়। মুসলমান সমাজে তালাকের মত জঘন্য প্রথার জন্য দিলারাবিবির মত কত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারীকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয়। তালাকের ভয়ে কত নারী নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে গুটিয়ে রাখে।নিজেকে তারা কখনোই ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করতে পারে না।

‘দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি’, ‘সুনেত্রার কথা’, ‘রূপ কথা নয়’ গল্পেও আমরা দেখি মেয়েরা আজও কীভাবে নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নারী শরীর লোলুপ পুরুষদের অবৈধ কামনা বাসনার শিকার হয়। পুরুষের চোখে নারী শুধুই দেহ সর্বস্ব। আজকের এই সভ্য সমাজে দাঁড়িয়েও অনেক পুরুষ নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে তাকে ভোগ করে তৃপ্ত হতে চায়। যার ফলস্বরূপ হাসিনা এবং মণিকার মত মেয়েদের অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় বহন করতে হয়।

এছাড়াও তাঁর গল্পের আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো নরনারীর প্রেম ও রোমাণ্টিকতা। তিনি আসলে প্রচন্ডভাবে একজন আধুনিক মনস্ক লেখক। তাই যৌবন তাঁর গল্পে প্রবলভাবে উপস্থিত।প্রেম, ভালবাসা, যৌনতা তাঁর গল্পের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।তাঁর কাছে প্রেম রূপ এবং রূপান্তরের মধ্যে বিধৃত।তাঁর প্রেমের বর্ণালী রামধনু রঙের মতো নানা রঙে নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দিক্ দিগন্তে। দেহ পেয়েছে দেহাতীতের স্বর্গীয় আস্বাদ।

তাঁর গল্পে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জৈবিক কামনা বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের স্বর্গীয় দ্যোতনাও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আগামীকাল, ভূমি ও আকাশ, স্বর্ণলতা প্রভৃতি গল্পে লেখক দেহজ প্রেমের এক মাদকতা, শারীরিক তাড়না ও মানসিক অনুভবের সহজ প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভালবাসা নিয়ে বুদ্ধিজীবির

বিতর্কে নামেননি লেখক। স্বাভাবিক তাড়নাতেই ছেলে মেয়েরা সামাজিক বন্ধনের পাশাপাশি যে অবন্ধনকেও চেয়েছে ‘আগামীকাল’ গল্পে লেখক সেটাকেই গল্পের আকারে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তপন, সুবর্ণা, রণজয় ও ভাস্বতী বিবাহিত জীবনের ভালবাসার বাইরেও ভালবাসার একটা মুক্ত জায়গা চায় যেখানে সবাই সবাইকে ভালবাসতে পারে, এরমধ্যে কোন পাপ, কলঙ্ক বা লজ্জার জায়গা নেই।

ভালবাসার মুক্তাঙ্গনে সবাই সবাইকে ভালবাসবে এমন একটা দুর্বার আকাঙ্খা যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে একটা বিশেষ চারিত্র্য হয়ে উঠেছিল, তেমনি ভালবাসার একটা বিশুদ্ধ নিখাদ রূপও তাঁর গল্পে বড়ই কাব্যময় হয়ে দেখা দিয়েছিল। মনীষার দুই প্রেমিক, ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়, স্বর্গের বারান্দায় প্রভৃতি গল্পে এই বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়াতীত বা দেহাতীত রোমান্টিক প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

‘মনীষার দুই প্রেমিক’ গল্পের মাধ্যমে লেখক রক্ত মাংসের জীবনের বাইরে নারী সৌন্দর্যের যে শিল্পরূপ আছে তাকে এক মুগ্ধ প্রেমিক কীভাবে আদর্শের চূড়ায় স্থান দিয়েছে সেটার এক অভিনব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।মনীষার স্বর্গীয় সৌন্দর্য মাধুরীকে মালিন্যমুক্ত রাখতে মনীষার অযোগ্য নীরব প্রেমিক বরুণের তিলে তিলে আত্মত্যাগ নিসর্গলোকে পৌঁছে গেছে।পূজারীর মত সে মনীষার প্রতি তার নিবিড় ভালবাসা ও উপলব্ধিকে রূপায়িত করতে চেয়েছে তার চেয়ে যোগ্যতর আর এক তরুণ অমলের মধ্য দিয়ে। তাই গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই অমলের নৈতিক অধঃপতন বরুণকে কতটা আহত করে তুলে। সে কিছুতেই এই অধঃপতনটা মেনে নিতে পারছিল না। তাই অসহায়ের মতো মনে মনে কাতর আর্তনাদ করতে থাকে-

‘অমল, তুমি যেয়ো না,...। এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করব কী করে?’[৯]

আপন মানসপ্রতিমার কাঙ্ক্ষিত পুরুষের আদর্শচ্যুতির ভয়ে উৎকণ্ঠিত নীরব প্রেমিকের হাহাকার সংবেদনশীল পাঠক মনে বিষাদের সুর ছড়িয়ে দেয়।

‘ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়’ গল্পে লেখক দু’টি নরনারীর অন্তর্নিহিত প্রেম নানা ধরনের রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের দ্বারা আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত করেছেন।এটি এক ধরনের রোমান্টিক প্রেমের গল্প, সেই সঙ্গে লেখকের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার ও পরিচয় পাওয়া যায়। দু’টি বাউল যুবক যুবতীকে নিয়ে মূলত গল্পটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।এরা বাউল গান করে।বাউল গানের প্রতিটি শব্দ যেমন নানা রূপক ও প্রতীকের দ্বারা রহস্যাবৃত, এই বাউল ছেলে মেয়ে দু’টি ও তেমনি রহস্যাবৃত। সব সময় রূপক মিশিয়ে কথা বলে। প্রতিটি কথাই কেমন যেন দ্ব্যর্থবোধক।

একদিন জামসেদপুরের রাস্তায় এক পড়ন্ত বিকেলের আলো আঁধারিতে ছেলেটিকে গাছতলার নির্জনতায় একা বসে গান গাইতে দেখে পুলিশ অফিসার রশিদ খান সঙ্গিনীটির কথা জিজ্ঞেস করায় সে নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দেয়, মরুভূমির লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

প্রায় তিন দিন থেকে মেয়েটি নিখোঁজ, অথচ ছেলেটি তাকে খোঁজার চেষ্টা করেনি। তাঁর বিশ্বাস সঙ্গিনীটি তার কাছে ফিরে আসবেই। সে আরও বলে-

“...যদি বাঁধন ছিড়তে না পারে, তাহলে বাঁধনের মধ্যেই সে ডুব দেবে। ... কোন বাঁধনই তাকে ধরে রাখতে পারবে না। শরীরটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সে আর থাকবে না সেখানে।... এই খাঁচা থেকেও পাখিটাকে উড়িয়ে দেব।”[১০]

কী গভীর বিশ্বাস আর ভালবাসা লুকিয়ে আছে প্রতিটি বয়ানে। কত সহজে সে বাস্তবটাকে মেনে নিয়েছে। কোনও রাগ নেই, দুঃখ নেই, হতাশা নেই, নেই কোনও আর্তনাদ। কী গভীর বিশ্বাস, আর কত সহজ উত্তরণের পথ।

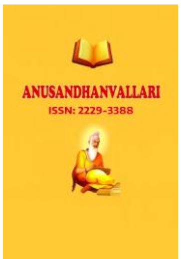

মরুভূমির রক্তচোষা পিশাচদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মেয়েটি যখন আবার ফিরে এলো তার বাউল সঙ্গীর কাছে, তখনও দু’জন কত নিরুত্তাপ, ভাবলেশহীন। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটি তার বাউল সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে গেয়ে উঠলো-

“সেই ফুল কোথায় গেল গো, যে ফুলে ভ্রমর বসেনি...।’’[১১]

রূপকের মাধ্যমে মেয়েটি হয়ত একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে সে আর অনাঘ্রাতা কুসুমটি নেই। তবে দু’জনের এই নিরুত্তাপ, উদাসীনতার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল এক তীব্র আকুতি, চিরন্তন ভালোবাসার এক তীব্র আবেগ। দেহটা তাদের কাছে বড় নয়, মনটাই বড়।

ধূলি মলিন সমাজের কদর্যতার মধ্যেও যে লুকিয়ে থাকে কিছু চিরন্তন ভালবাসা লেখক এই গল্পের মাধ্যমে সেই উপলব্ধিকেই ব্যঞ্জিত করেছেন। আমাদের সমাজের আনাচে কানাচে যেমন ঘাপটি মেরে বসে থাকে কিছু রক্তচোষা জীব, তেমনি আছে চিরন্তন ভালোবাসার প্রতীক বাউল ছেলে মেয়ে দু’টির মত কিছু নিষ্পাপ প্রাণ, যারা প্রাত্যহিক সমাজের কদর্যতার অনেক ঊর্ধ্বে। লেখকের অন্বেষণী দৃষ্টি ও সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভবের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এভাবেই খুঁজে নিয়েছেন আপাত সাধারণ ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীরতর অভিব্যক্তিকে।

প্রেম ও ভালবাসার তাৎপর্য মানুষের জীবনকে কোন্ সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরকে কীভাবে উদ্ভাসিত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তুলে তারই এক রূপক অনুষঙ্গে গড়ে তোলা গল্প ‘স্বর্গের বারান্দায়’। প্রেম ও প্রেমহীনতা ‘মনীষার দুই প্রেমিক’ গল্পটির মত এখানেও সমান্তরাল ও বিপরীত বুননের মধ্য দিয়ে পাশাপাশি চলেছে, স্মৃতিচারি নিবন্ধের ভঙ্গিতে।

ভালবাসার নানা আবেগকে মুক্তি দেবার এক স্বাভাবিক প্রয়াস যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ষাট-সত্তরের দশকে যে কঠিন সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেই সময়কার হত্যার

রাজনীতির হৃৎস্পন্দনও শোনা যায় তাঁর একাধিক ছোটগল্পে।‘পলাতক ও অনুসরণকারী’ গল্পেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে নিষ্ঠুরতার এক নির্লিপ্ত ভয়ংকর ছবি ফুটে উঠে, যেখানে হত্যা বা মৃত্যু একটা নির্লিপ্ত ব্যাপার মাত্র।‘বিজন তুমি কি’ গল্পটিও বর্ণনার দক্ষতায় অসম্ভব স্পন্দনময় হয়ে উঠেছে। যে আদর্শবাদের জন্য হত্যা করা হয় তাতে সেই হত্যা যতই ব্যক্তিসম্পর্ক বর্জিত হোক না কেন, হত্যার সেই নৃশংসতা মানুষের বোধের গভীরে বিবেক দংশন আনতেই পারে। সমস্ত গল্পটির মধ্যে ‘বিজন, তুমি কি অন্যায় করেছ? না, অন্যায় করিনি’-এই আত্মগত প্রশ্ন ও উত্তর বারবারই অনুরণিত হতে থাকে। সমস্ত গল্পটির মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শবাদের নিষ্ঠুর তাড়না আর গভীর মানবিকবোধের তীব্র অনিবার্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর ‘কঠিন প্রশ্ন’ গল্পটির রচনাকাল ১৯৭৩-৭৪ সাল। এই গল্পে তিনি সেই সময়ে শিক্ষা জগতে যে অরাজকতা ও নীতিহীনতা বিরাজ করছিল তারই এক তথ্যচিত্র তুলে ধরেছেন। যে সময়ের বিষয়বস্তু নিয়ে গল্পটি লেখা তখন এ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল অরাজকতার এক বিষাক্ত বাতাস। রাজ্য জুড়ে যে নৈরাজ্যের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল শিক্ষা ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছিল বেশ ভালভাবেই। গণটোকাটুকি একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে পর্যন্ত সারা রাজ্য আদর্শহীনতা ও নীতিহীনতার মুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই সময়কালকে দুঃস্বপ্নের দিবারাত্রি হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এই গল্পের দু’টি মুখ্য চরিত্র অমরেশ ও সুতপা দু’জনই আদর্শবান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও সেই সময়ের কাছে কেমন করে আত্ম সমর্পণ করে ফেললো, তারই লেখচিত্র এই গল্পটি।

অস্বাভাবিক চরিত্রের নিপুণ বিন্যাস তাঁর কিছু গল্পে নতুন স্বাদ তৈরি করেছে। এরকমই একটি গল্প ‘বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য’।একটি অদ্ভুত প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত বিজন দিনের পর দিন ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়ের সঙ্গে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলে এক আপাত সফল অফিসার প্রশান্ত নয়ন দাশগুপ্তকে। তবে সামাজিক সাফল্য ও খোলসের তলায়

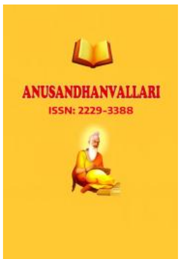

মানুষের ব্যক্তিগত অসহায়তা এবং জীবিকার সঙ্গে তার আপোসের দুর্বলতম গোপন সূত্রটি আবরণহীন হয়ে পড়ে এক নাটকীয় মুহূর্তে।

জীবনের অর্থহীনতাকে অনেক সময় আমরা বোকার মত কি প্রবলভাবে আঁকড়ে থাকি সেই সরল সত্যকে উদ্ঘাটনই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পের উদ্দেশ্য। নিয়তি প্রতিনিয়ত আমাদের একই অন্ধবৃত্তের ঘানিতে ঘুরিয়ে মারছে।পুনঃপৌনিকতার দীর্ঘ পরিসরে চোখ খোলা রাখলে তখনই টের পাওয়া যায় কার্যকারণসূত্রে কীভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। হনিত এবং হননকারী, শিকারী এবং শিকার এই জগতে অনিবার্যভাবে নিজেদের ভূমিকা বদল করে চলেছে। ‘পলাতক এবং অনুসরণকারী’ গল্পে সেই ধারাবাহিক ঘাতকতাকেই অত্যন্ত আবেগশূন্য আঙ্কিক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন লেখক। শুধুই পুনরাবৃত্তি আর পুনরাবৃত্তি।এক রুদ্ধশ্বাস নিঃশব্দ জিজ্ঞাসায় শেষ হয়েছে ধাবমান ঘটনাগুচ্ছ।বিবৃতিধর্মী সাদামাটা ভাষায় একেবারে বাহুল্যহীন কতকগুলো নাট্যদৃশ্যের অবতারণা শেষপর্যন্ত এমন এক ধূসর উদাসীনতায় পৌঁছে দেয় যেখানে কবিতার বিষাদ মূর্ত হয়ে উঠে।

যেকোন পরিসরেই পরিবেশকে বাস্তবায়িত করে তোলার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল লেখকের। খুব সামান্য এবং সাধারণ কোন ঘটনার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংলাপ এবং মুখের মাপে মানানসই কথা, যার ফলে মানুষগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠে। এ রকমই একটি চমৎকার গল্প ‘খরা’।

লেখকের নিজস্ব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়ে উঠেছে ‘বহুলাড়া’ গল্পটি। লেখক একবার তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান শৌভিককে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ায়। সেখানে গিয়ে একটা অপ্রত্যাশিত প্রাচীন মন্দির আবিষ্কার করেন। সেই দর্শনীয় প্রাচীন মন্দির ও তার কাছাকাছি যে সম সাময়িক বাস্তবতা, তার উপলব্ধি নিয়েই রচিত হয়েছে ‘বহুলাড়া’ গল্পটি।

মানবজীবন, মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব, সমাজের বিভিন্ন রূপ ও বাস্তবতা, দেশভাগ ও তার অস্থির পরিবেশ কোনকিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে মানবজীবন ও তার পারিবার্শ্বিকতাকে গভীরভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর অধিকাংশ গল্পই জীবন রসে সঞ্জীবিত।মানবজীবন সম্পৃক্ত প্রতিটি ধারাই তাঁর গল্পের অন্তর্জালে ধরা পড়েছে।কিছু কিছু গল্পে লেখক নিজের জীবনের বহু ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন টুকরো টুকরোভাবে। কোন কোন গল্পে ঘটনার চেয়ে গল্পের অন্তর্বয়নই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

সমাজের নীচু তলার মানুষ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোক, মুসলমান সমাজ, তৎকালীন যুব সমাজ ও তাদের মানসিকতা, দেশের নীতিহীন পরিস্থিতি, অন্ধবিশ্বাস, সমাজে নারীর অবস্থান ও তাদের অসহায়তা, প্রেমের বিভিন্ন রূপ কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, সেই উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা এবং আবিষ্কার থেকে তিনি তাঁর গল্পের ঢালি সাজিয়েছেন। তাই তাঁর গল্পগুলি এত বাস্তবমুখী ও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর।

লেখক সুনীল জীবনে বহুবার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূল ও উৎকেন্দ্রিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। ইতিহাসের অমোঘ বাস্তব যখন বহির্জগৎ ও তার চেনা অবয়বকে আমূল বদলে দেয়, ব্যক্তির অন্তর্জগৎও তখন অটুট থাকে না। রূপান্তরের সময়ে বাস্তবের সমান্তরালভাবে অন্তর্বাস্তবে ও কত জটিল ধূপ ছায়া সঞ্চারিত হয়, তা তিনি নিবিষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন।

অবশেষে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পবীক্ষা অবলোকন করে আমরা বলতে পারি যে, এত বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁর ছোটগল্পগুলি বহুমাত্রিকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং গল্পগুলিতে বাস্তবের নানামাত্রিক উপস্থিতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবতার আশা-

আকাঙ্খা ও প্রেম ভালবাসার এক চিরায়ত দলিল হয়ে উঠেছে লেখক সুনীলের গল্প সম্ভার।

সূত্রনির্দেশ-

১. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'গল্প সমগ্র', ১ম খণ্ড, বিশ্ববাণী, কল-৯, মুখবন্ধ

২. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'নির্বাচিত রচনা', পুনশ্চ, কল-৯, ফেব্রুয়ারি-১৯৭২, 'শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী', পৃঃ ৭৮১

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮১

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮৫

৫. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'সুনীলের সেরা ১০১', পত্রভারতী, কল-৯, ডিসেম্বর ২০০৮, 'মাত্র আধখানা শতাব্দী', পৃঃ ১৪৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯

৭. 'সাহিত্য সেতু', (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা), সম্পাদক- শুভেন্দু সেনগুপ্ত, জগবন্ধু কুন্‌ডু কর্তৃক বাঁশবেড়িয়া হুগলী থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ১০৪

৮. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'প্রেমের গল্প', মন্ডল বুক হাউস, কল-৯, আশ্বিন ১৩৯০, 'আমার একটি পাপের কাহিনী', পৃঃ ২৩০

৯. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৭, 'মনীষার দুই প্রেমিক', পৃঃ ৫৯

১০. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'নির্বাচিত রচনা', 'ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়', পৃঃ ৮৩৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩৮